بسم الله الرحمن الرحيم

যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড, সারেস্থ) ইসলামাবাদের মুবারক মসজিদে প্রদত্ত সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ০৪ জুলাই, ২০২৫ মোতাবেক ০৪ ওয়াফা, ১৪০৪ হিজরী শামসী'র জুমুআর খুতবা

তাশাহ্হুদ, তা'উয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন,

মক্কা বিজয়ের প্রেক্ষাপটে মক্কায় প্রবেশকালের বৃত্তান্ত গত খুতবায় উপস্থাপন করা হয়েছিল। এর বিস্তারিত বিবরণ এভাবে বর্ণিত হয়েছে: ইবনে ইসহাক লিখেছেন, আবু সুফিয়ান যখন তার পাশ দিয়ে অতিক্রম করা আল্লাহ্ তা'লার বাহিনীকে দেখে (মক্কায়) পৌঁছাল, ততক্ষণে মুসলমানরা যী-তোয়াতে পৌঁছে গিয়েছিল, যা মসজিদুল হারাম থেকে আধা মাইল দূরে অবস্থিত মক্কার একটি উপত্যকা। সাহাবীরা সেখানে পৌঁছে মহানবী (সা.)-এর অপেক্ষায় ছিলেন। একপর্যায়ে সমস্ত সাহাবী সেখানেই সমবেত হন। তিনি (সা.) তাঁর সবুজ পোশাক পরিহিত দলটির সাথে আসেন। ইবনে সা'দ লেখেন, তিনি (সা.) তাঁর উটনী 'কাসওয়া'র পিঠে হযরত আবু বকর এবং উসায়েদ বিন হুযায়েরের মাঝখানে বসা ছিলেন।

হযরত আবদুল্লাহ্ বিন মুগাফফাল বর্ণনা করেন, আমি রসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে দেখেছি, মক্কা বিজয়ের দিন তিনি তাঁর উটনীর ওপর ছিলেন এবং সূরা ফাতহ পাঠ করছিলেন। এই রেওয়ায়েতটি বুখারীতে বর্ণিত হয়েছে। হযরত আনাস (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, তিনি (সা.) যখন মক্কা মুকাররামায় প্রবেশ করেন তখন মানুষ তাঁকে দেখার জন্য আসে। বিনয়ের কারণে তাঁর (সা.) মাথা হাওদা স্পর্শ করছিল; অর্থাৎ উটের পিঠে যে গদি ছিল, যেখানে তিনি বসা ছিলেন, তার সামনের অংশকে স্পর্শ করছিল। মক্কা মুকাররামায় প্রবেশের সময় তিনি কালো রঙের পাগড়ি পরিহিত ছিলেন। তাঁর ঝান্ডাও কালো ছিল এবং পতাকাও কালো ছিল। কতক রেওয়ায়েত অনুযায়ী ছোটো ঝান্ডা অর্থাৎ পতাকাটি সাদা রঙের ছিল। তিনি (সা.) যী-তোয়া নামক স্থানে লোকজনের মাঝে তিনি দণ্ডায়মান হন। বিজয় এবং মুসলমানদের বিপুল জনরাশি দেখে বিনয়ের কারণে তাঁর পবিত্র শ্মশ্রু হাওদা স্পর্শ করছিল অথবা স্পর্শ করার উপক্রম হয়েছিল। তিনি (সা.) বলেন, اللهم ان العيش عيش الآخرة অর্থাৎ, হে আল্লাহ্! নিশ্চয় প্রকৃত জীবন হলো পরকালের জীবন। ন্যায়বিচার ও ইনসাফ এবং বিনয় ও নম্রতার আরেকটি দিক এটি ছিল যে, তিনি (সা.) তাঁর পেছনে নিজের মুক্ত করা ক্রীতদাস যায়েদ বিন হারেসার পুত্র উসামাকে আরোহণ করিয়ে রেখেছিলেন, অথচ সেখানে কুরাইশ নেতৃবৃন্দ এবং বনু হাশেমের সন্তানরাও উপস্থিত ছিল। তিনি (সা.) ২০ রমযানুল মোবারক তারিখে মক্কায় প্রবেশ করেন আর তখন সূর্য কিছুটা উদিত হয়ে গিয়েছিল। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বর্ণনা করেন:

সেই মাহাত্ম্য যা খোদা তা'লার বিশেষ বান্দাদের প্রদান করা হয়, তা বিনয়ের পোষাকে প্রকাশ পায়, আর শয়তানের উচ্চতায় অহংকার মিশ্রিত থাকে। দেখো! আমাদের নবী করীম (সা.) যখন মক্কা বিজয় করেন তখন তিনি সেভাবেই নিজের মাথা ঝুঁকিয়েছেন আর সিজদা করেছেন, যেভাবে তিনি সেসব বিপদ ও কষ্টের দিনগুলোতে মাথা ঝোঁকাতেন ও সিজদা করতেন, যখন এই মক্কাতেই সকলভাবে তাঁর বিরোধিতা করা হতো এবং তাঁকে কষ্ট দেওয়া হতো। তাঁর হৃদয় আল্লাহ্র কৃতজ্ঞতায় পূর্ণ হয়ে যায় এবং তিনি সিজদাবনত হন,

যখন তিনি (সা.) তাঁর এখান থেকে (মক্কা থেকে) বের হবার ও ফিরে আসার বিষয়টি তুলনা করেন।

মক্কা বিজয়ের দিনে তিনি (সা.) কোথায় অবস্থান করেছিলেন– এ সম্পর্কে লেখা আছে:

মক্কার কাছাকাছি পৌঁছে যখন তাঁর (সা.) কাছে নিবেদন করা হয়, মক্কায় কোথায় অবস্থান করবেন? তখন তিনি (সা.) বলেন, মক্কায় আকীল আমাদের জন্য কোনো ঘর বাকি রেখেছে নাকি? আকীল ছিলেন হযরত আবু তালেবের পুত্র এবং তিনি হুদাইয়বিয়ার সন্ধির কিছুকাল পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। আর বলা হয়, এর পূর্বেই তিনি সমস্ত সম্পত্তি বিক্রি করে দিয়েছিলেন। এরপর তিনি (সা.) বলেন, আমাদের অবস্থান খাইফ বনী কিনানা-তে হবে যেখানে কুরাইশরা কুফরের বিষয়ে শপথ করেছিল, আর সকল সাহাবীকে সেখানেই সমবেত হবার নির্দেশ দেওয়া হয়। হযরত জাবের (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে যে, সেদিন আমিও তাদের মাঝে ছিলাম যারা তাঁর (সা.) সাথে ছিল। মক্কা বিজয়ের দিন আমি মহানবী (সা.)-এর সাথেই প্রবেশ করি এবং তিনি (সা.) মক্কার ঘরগুলি দেখে থেমে যান। তিনি (সা.) তখন আল্লাহ্ তা'লার প্রশংসা ও মহিমা কীর্তন করেন। তিনি (সা.) তাঁর তাঁবুর স্থানের দিকে তাকিয়ে বলেন, হে জাবের! এটি আমাদের অবস্থানস্থল। এখানেই কুরাইশরা আমাদের বিরুদ্ধে কুফরের অবস্থায় শপথ করেছিল। হযরত জাবের (রা.) বলেন, এতে আমার সেই কথা স্মরণ হয় যা আমি মদীনায় তাঁর (সা.) কাছে শুনেছিলাম। অর্থাৎ তিনি (সা.) বলেছিলেন, যখন আমরা মক্কা বিজয় করব, তখন আমাদের অবস্থান খাইফ বনু কিনানায় হবে যেখানে কুফরের অবস্থায় তারা শপথ করেছিল যে, তারা বনু হাশেমের সাথে কেনা-বেচা করবে না আর তাদের সাথে বিয়েশাদিও করবে না এবং তাদেরকে আশ্রয়ও দেবে না, আর তাদেরকে শে'বে আবী তালেব নামক একটি উপত্যকায় অবরুদ্ধ থাকতে বাধ্য করে।

আলেমদের মতে, মহানবী (সা.) সম্ভবত আল্লাহ্ তা'লার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশস্বরূপ এখানে থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন; এটি হলো কারো কারো মত। কিছু রেওয়ায়েত অনুসারে তাঁর (সা.) কাছে মক্কায় নিজের বাড়ির পরিবর্তে অন্য কারো বাড়িতে অবস্থান করার প্রস্তাব দেওয়া হয়। তিনি (সা.) অস্বীকৃতি জানিয়ে বলেন, আমি অন্য কারো বাড়িতে প্রবেশ করব না। হযরত আবু রাফে (রা.) হাজুন নামক স্থানে তাঁর (সা.) তাঁবু স্থাপন করেছিলেন। মহানবী (সা.)-এর সাথে তাঁর সহধর্মিণীদের মধ্য থেকে হযরত উম্মে সালামা এবং মাইমুনা (রা.) ছিলেন। তিনি (সা.) প্রতি ওয়াক্ত নামাযের জন্য হাজুন থেকে মসজিদুল হারামে আগমন করতেন।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বিভিন্ন ইতিহাসের গ্রন্থ থেকে নিয়ে বর্ণনা করেন, আল্লাহ্‌র রসূল (সা.) যখন মক্কায় প্রবেশ করেন তখন লোকেরা তাঁকে (সা.) জিজ্ঞেস করে, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আপনি কি নিজ বাড়িতে অবস্থান করবেন? মহানবী (সা.) বলেন, আকীল কি আমাদের জন্য কোনো ঘর বাকি রেখেছে? অর্থাৎ আমার হিজরতের পর আমার আত্মীয়স্বজনরা আমার সমস্ত সহায়-সম্পত্তি বিক্রি করে খেয়ে ফেলেছে। এখন মক্কায় আমার জন্য কোনো ঠিকানা নেই। আকীল মহানবী (সা.)-এর চাচাতো ভাই। এরপর তিনি (সা.) বলেন, আমরা খাইফ বনী কিনানায় অবস্থান করব। এটি ছিল মক্কার একটি উন্মুক্ত ময়দান যেখানে কুরাইশ ও বনু কিনানা গোত্র একত্রে মিলে শপথ করেছিল যে, যতক্ষণ বনু হাশেম এবং বনু আব্দিল মুত্তালিব মুহাম্মদ (সা.)-কে বন্দি করে আমাদের হাতে তুলে না দেবে এবং তাঁর (সা.) সঙ্গ দেওয়া পরিত্যাগ না করবে, ততক্ষণ আমরা তাদের সাথে বিয়েশাদিও করব

না, ক্রয়-বিক্রয়ও করব না। এই অঙ্গীকারের পর আল্লাহ্‌র রসূল (সা.) ও তাঁর চাচা আবু তালেব এবং তাঁর (সা.) জামা'তের সকল সদস্য আবু তালেব-এর উপত্যকায় আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং তিন বছরের কঠোর কষ্ট সহ্য করার পর খোদা তা'লা তাদের মুক্তি দান করেছিলেন। মহানবী(সা)-এর এই নির্বাচন কতই না সূক্ষ্ম, সুন্দর ছিল। মক্কাবাসীরা এই স্থানেই শপথ করেছিল, যতদিন পর্যন্ত মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে আমাদের হাতে তুলে না দেওয়া হবে ততদিন আমরা তার (সা.) গোত্রের সাথে সন্ধি করব না। আজ আল্লাহ্‌র রসূল মুহাম্মদ (সা.) সেই ময়দানেই গিয়ে অবস্থান নেন আর (এভাবে) যেন মক্কাবাসীদের বলেন, তোমরা যেখানে চেয়েছিলে আমি সেখানেই এসেছি। কিন্তু বলো তো দেখি! তোমাদের মাঝে এই শক্তি আছে কি, আজ তোমরা আমায় তোমাদের নির্যাতনের লক্ষ্যে পরিণত করবে? সেই একই স্থান, যেখানে তোমরা আমাকে লাঞ্ছিত ও অপমানিত অবস্থায় দেখতে চেয়েছিলে এবং আকাঙ্ক্ষা রাখতে– আমার জাতি আমাকে ধরে যেন এখানেই তোমাদের হাতে তুলে দেয়, সেখানে আমি এমন অবস্থায় এসেছি যে, শুধু আমার জাতিই নয় বরং গোটা আরবও আমার সাথে আছে এবং আমার জাতি আমাকে তোমাদের হাতে তুলে দেয় নি, বরং আমার জাতি তোমাদেরকেই আমার হাতে সোপর্দ করে দিয়েছে। খোদা তা'লার কী লীলা দেখুন! এই দিনটিও সোমবার ছিল, এই দিনটিতেই মহানবী (সা.) সওর গুহা থেকে বের হয়ে শুধুমাত্র হযরত আবু বকর (রা.)-কে সঙ্গে নিয়ে মদীনা অভিমুখে হিজরত করেছিলেন; এই দিনেই তিনি (সা.) আক্ষেপের সাথে সওর পাহাড় থেকে মক্কার দিকে তাকিয়ে বলেছিলেন, **হে মক্কা! তুমি আমার কাছে পৃথিবীর সকল জনবসতির চেয়ে অধিক প্রিয়, কিন্তু তোমার অধিবাসীরা আমাকে এখানে থাকতে দিল না।**

হযরত উম্মে হানী বিনতে আবী তালেব (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) যখন মক্কার উচ্চভূমিতে শিবির স্থাপন করেন তখন বনু মাখযুম (গোত্র) থেকে আমার শ্বশুরবাড়ির দুইজন আত্মীয় পালিয়ে আমার কাছে আসে। আমার ভাই হযরত আলী (রা.) আমার কাছে আসে এবং সে বলে, খোদার কসম! আমি এই দুইজনকে হত্যা করব। আমি এই দুইজনকে আমার গৃহে আশ্রয় দিয়েছি। এরপর আমি স্বয়ং মহানবী (সা.)-এর নিকট মক্কার সেই উঁচু স্থানে আসি। আমি তাঁকে (সা.) পানির একটি পাত্র থেকে গোসল করতে দেখি যাতে মাখা আটার চিহ্ন বিদ্যমান ছিল এবং তাঁর (সা.) কন্যা হযরত ফাতেমা (রা.) একটি কাপড় দ্বারা তাঁর জন্য আড়ালের ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন। গোসলের পর তিনি (সা.) তাঁর পোশাক পরিবর্তন করেন, এরপর চাশতের সময়ে আট রাকআত নামায পড়েন। এরপর তিনি (সা.) আমার দিকে তাকিয়ে বলেন, হে উম্মে হানী, স্বাগতম! তুমি কেন এসেছ? তিনি সেই দুই ব্যক্তি এবং হযরত আলী (রা.) সংক্রান্ত পুরো ঘটনা খুলে বলেন যে, এভাবে হযরত আলী (রা.) তাদেরকে হত্যা করতে চায়, কিন্তু আমি তাদেরকে আমার ঘরে লুকিয়ে রেখে এসেছি। তিনি (সা.) বলেন, যাদেরকে তুমি আশ্রয় দিয়েছ তাদেরকে আমরাও আশ্রয় দিচ্ছি এবং যাদেরকে তুমি নিরাপত্তা প্রদান করেছ তাদেরকে আমরাও নিরাপত্তা প্রদান করছি। অতএব, সে যেন ঐ দুইজনকে হত্যা না করে। অর্থাৎ মহানবী (সা.) বলেছেন, হযরত আলী তাদেরকে হত্যা করবে না। এই দুইজন ব্যক্তি হযরত উম্মে হানীর (রা.) শ্বশুরবাড়ির আত্মীয় হারেস বিন হিশাম ও আব্দুল্লাহ্ বিন রবী'আ ছিলেন।

বুখারীর একটি রেওয়ায়েতে আছে, আব্দুর রহমান বিন আবী লায়লা (রা.) বর্ণনা করেন, আমার কাছে কেউ একথা বর্ণনা করেছে, উম্মে হানী ব্যতীত অন্য কেউ মহানবী (সা.)-কে চাশতের নামায পড়তে দেখে নি। অর্থাৎ এই রেওয়ায়েতটি কেবল উম্মে হানী

বর্ণিত যে, মহানবী (সা.) চাশতের নামায পড়ছিলেন; এ ঘটনার আর কোনো সাক্ষী পাওয়া যায় না। হযরত উম্মে হানী (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) মক্কা বিজয়ের দিন তাঁর বাড়িতে আসেন এবং তিনি গোসল করেন আর আট রাকআত নামায পড়েন। আমি এর চেয়ে বেশি সংক্ষিপ্ত নামায আর দেখি নি, কিন্তু তিনি (সা.) পূর্ণরূপে রুকু ও সিজদা করতেন; এটি বুখারীর হাদীস। মহানবী (সা.) যে আট রাকআত নামায পড়েছেন, এটি কোন নামায ছিল– এ সম্পর্কে আলেমগণ বিভিন্ন মতামত ব্যক্ত করেছেন। কেউ কেউ বলেছেন, এটি চাশত বা ইশরাকের নামায ছিল। কারো মতে এটি ইশরাকের নামায ছিল, আবার কারো মতে চাশতের নামায ছিল। কারো কারো মতে এটি 'বিজয়ের নামায' ছিল যা কোনো শহর বা দুর্গ ইত্যাদি জয়ের পর কৃতজ্ঞতাস্বরূপ পড়া হয়, আর একই রীতির অনুসরণে পরবর্তীকালে ইসলামের আমীরগণও বিভিন্ন (স্থান) জয়ের পর আট রাকআত নামায পড়তে আরম্ভ করেছিলেন। আরেকটি অভিমত হলো, মক্কা বিজয়ের রাতে যেহেতু অতি গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিষয়াদি দৃষ্টিপটে ছিল, যার দরুন মহানবী (সা.) এত ব্যস্ত থাকেন যে, তাহাজ্জুদের নামায পড়ার সময় পান নি– তা তিনি (সা.) ঐ সময় অর্থাৎ সকালবেলা আদায় করেন। হয়ত এ কারণেই একটি ধর্মীয় মাসলা হলো, যদি কোনো কারণে তাহাজ্জুদ নামায না পড়া হয়ে থাকে, তাহলে সকালে সূর্যোদয়ের পরে আট রাকআত নামায পড়ে নেওয়া সমীচীন।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) বলেছেন, যদি তোমরা কোনো দিন তাহাজ্জুদের নামায পড়তে না পারো তাহলে (কমপক্ষে) ইশরাকের নামায পড়ে নিও। কোনো কোনো রেওয়ায়েতে এটিও দেখা যায়, তিনি (সা.) কোনো সময় তাহাজ্জুদ পড়তে না পারলে এর স্থলে ইশরাকের নামায পড়ে নিতেন।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) লুধিয়ানানিবাসী মীর আব্বাস আলী সাহেবের উদ্দেশ্যে এক পত্রে লেখেন, এই অধম পূর্বে লিখেছিল, আপনি আপনার রীতি অনুসারে সব যিকর-আযকার অব্যাহত রাখুন। শুধুমাত্র এমন রীতিনীতি এড়িয়ে চলা উচিত যেগুলোতে কোনো প্রকার শিরক বা বিদআত রয়েছে। আল্লাহ্‌র রসূল (সা.) কর্তৃক ইশরাকের নামায সবসময় আদায় করা সাব্যস্ত নয়। এটি প্রমাণ হয় না যে, তিনি (সা.) নিয়মিত ইশরাকের নামায পড়তেন। তাহাজ্জুদ নামায ছুটে গেলে অথবা সফর থেকে ফিরে (ইশরাকের নামায পড়া) প্রমাণিত, কিন্তু ইবাদত-বন্দেগী করতে চেষ্টা করা আর সম্মানিত স্রষ্টার দ্বারে পড়ে থাকাই সুন্নত-সম্মত। অর্থাৎ ইবাদত-বন্দেগীর চেষ্টা অব্যাহত রাখা আর আল্লাহ্ তা'লার দরবারে পড়ে থাকাই হলো আসল সুন্নত।

মসজিদে হারামে প্রবেশ এবং তাওয়াফ করা সংক্রান্ত তথ্য হলো, মহানবী (সা.) দিনের কিছু অংশ তাঁর তাঁবুতে অবস্থান করেন। এরপর তিনি তাঁর উটনী **'কাসওয়া'**কে আনতে বলেন। সেটিকে তাঁর তাঁবুর দরজার কাছে আনা হয়। তিনি (সা.) অস্ত্র নিতে এবং শিরস্ত্রাণ পরিধান করতে চলে যান। সাহাবীরা (রা.) তাঁর চতুষ্পার্শ্বে বৃত্তাকারে দণ্ডায়মান হন। মহানবী (সা.) তাঁর বাহনে আরোহণ করেন। খান্দামা থেকে হাজুন পর্যন্ত ঘোড়ার ঢেউ খেলানো সারি বিস্তৃত ছিল। মহানবী (সা.) সেই পথ দিয়ে যান। তাঁর সাথে হযরত আবু বকর (রা.) ছিলেন। তিনি তার সাথে কথা বলছিলেন। হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে উমর (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) মক্কা বিজয়ের সময় **ক্বাদা'** পর্বতের দিক থেকে মক্কায় প্রবেশ করার সময় লক্ষ্য করেন, মহিলারা তাদের ওড়না দিয়ে ঘোড়াগুলোর মুখে আঘাত করে সেগুলোকে পেছনে সরিয়ে দিচ্ছে। তখন মহানবী (সা.) স্মিত হেসে হযরত আবু বকর (রা.)-র দিকে তাকিয়ে বলেন, হে আবু বকর (রা.), হাসসান বিন সাবিত কী লিখেছে? অর্থাৎ,

হাসসান বিন সাবিত (রা.) কোনো কবিতা পাঠ করেছিলেন, সেটাই জানতে চান। অতএব, হযরত আবু বকর (রা.) সেই পঙক্তিগুলো পাঠ করেন। যার অনুবাদ হলো, **আমার প্রিয় কন্যা হারিয়ে যাক, অর্থাৎ আমার মন্দ হোক, যদি তুমি এমন সেনাবাহিনীকে ধুলো উড়াতে না দেখ, যেগুলোর প্রতিশ্রুত স্থান হলো ক্বাদা' পাহাড়। সেসব দ্রুতগামী ঘোড়া নিজেদের লাগাম ছিঁড়ে অনিয়ন্ত্রিত হবার প্রয়াস পাচ্ছিল। নারীরা তাদের ওড়না দিয়ে (ঘোড়াগুলোকে) আঘাত করছিল।** হযরত ইবনে উমর (রা.) ঘোড়াগুলোর এ চিত্রই অঙ্কন করেন আর তখন অবিকল একই ঘটনা ঘটছিল। হযরত ইবনে উমর (রা.) এবং হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, মক্কা বিজয়ের দিন মহানবী (সা.) পবিত্র মক্কায় প্রবেশ করেন। কা'বাগৃহের চতুর্দিকে তখন প্রায় তিনশ ষাটটি প্রতিমা স্থাপিত ছিল যেগুলো সীসা গলিয়ে স্থাপন করা হয়েছিল। **হুবল** ছিল সবচেয়ে বড়ো প্রতিমা। এটি কা'বাগৃহের সামনে ছিল। **ইসাফ** ও **নায়েলা** সেখানে ছিল যেখানে লোকেরা পশু জবাই করত। মহানবী (সা.)-এর হাতে ধনুক ছিল। তিনি (সা.) ধনুকের এক প্রান্ত ধরেন। তিনি (সা.) যখনই কোনো প্রতিমার পাশ দিয়ে যেতেন তখন এটি (ধনুক) দিয়ে প্রতিমার চোখে আঘাত করতেন এবং বলতেন, **جَآءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوْقًا** (সূরা বনী ইসরাঈল: ৮২) অর্থাৎ "সত্য এসে গেছে এবং মিথ্যা পালিয়ে গেছে; নিশ্চয়ই মিথ্যা পলায়ন করারই ছিল।" তিনি (সা.) কা'বাগৃহের কাছাকাছি পৌঁছেন এবং সেটি দেখেন। মহানবী (সা.) স্বীয় বাহনে চড়ে এগিয়ে যান আর নিজের লাঠি দিয়ে হাজরে আসওয়াদ স্পর্শ করেন এবং **আল্লাহু আকবার** বলেন। উত্তরে মুসলমানরাও তাকবীর ধ্বনি দেন। তারা (রা.) বার বার তকবীর ধ্বনি উচ্চকিত করতে থাকেন, এমনকি (গোটা) মক্কা নগরী আল্লাহু আকবার ধ্বনিতে প্রকম্পিত হতে থাকে। অতঃপর মহানবী (সা.) তাদেরকে নীরবতা অবলম্বনের ইঙ্গিত করেন। মুশরিকরা পাহাড়ের ওপর থেকে এই দৃশ্য দেখছিল। মহানবী (সা.) কা'বাগৃহ তাওয়াফ করেন। হযরত মুহাম্মদ বিন মাসলামা (রা.) উটনীর লাগাম ধরে রেখেছিলেন। মহানবী (সা.) হাজরে আসওয়াদের নিকটে আসেন, তা স্পর্শ করেন এবং কা'বা শরীফ তাওয়াফ করেন। তাওয়াফ শেষে তিনি (সা.) নিজ উটনীর পিঠ থেকে নীচে অবতরণ করেন। হযরত ইবনে উমর (রা.) বর্ণনা করেন, আমরা মসজিদে উটনী বসানোর কোনো জায়গা পাই নি, ফলে তিনি (সা.) লোকদের হাতের ওপর ভর দিয়ে নামেন। [অর্থাৎ লোকেরা হাত বাড়িয়ে দেয় আর মহানবী (সা.) লোকদের হাতের ওপর পা রেখে উট থেকে নীচে নেমে আসেন।] পরে উটনীটিকে বাইরে নিয়ে যাওয়া হয়। হযরত মুআম্মার ইবনে আব্দুল্লাহ্ (রা.) আসেন এবং উটনীটিকে নিয়ে উপত্যকার দিকে চলে যান।

একটি বর্ণনায় আছে, মহানবী (সা.) মক্কা বিজয়ের সময় **বাতাহাতে** থাকা অবস্থায় হযরত উমর বিন খাত্তাব (রা.)-কে আদেশ দেন, তিনি যেন কা'বা ঘরে প্রবেশ করেন এবং সেখানে থাকা সকল ছবি মুছে ফেলেন। যতক্ষণ না সব ছবি মুছে ফেলা হয়, ততক্ষণ মহানবী (সা.)-এর মধ্যে প্রবেশ করেন নি। হযরত ইবরাহীম (আ.) ও হযরত ইসমাঈল (আ.)-এর ছবিও বের করে দেওয়া হয়। তাদের উভয়ের হাতে ভাগ্য নির্ধারক চিহ্ন সম্বলিত তির ছিল। [তাদের ছবিও সেখানে বানিয়ে রাখা হয়েছিল কিংবা মূর্তি বানানো ছিল।] মহানবী (সা.) এ সকল ছবি দেখে বলেন, আল্লাহ্ এই মূর্তিপূজকদের ধ্বংস করুন! এ সকল মূর্তিপূজারী কি জানে– তারা উভয়ে [অর্থাৎ হযরত ইবরাহীম ও ইসমাঈল (আ.)] কখনো এগুলোর দ্বারা ভাগ্য নির্ধারণ করেন নি? [তাদের হাতে যে তির রয়েছে– এগুলো মিথ্যা ও বানোয়াট গল্পের ফলশ্রুতি; তারা কখনও এমনটি করেন নি।] মহানবী (সা.) মাকামে ইবরাহীম-এ আসেন।

তিনি (সা.) বর্ম পরিহিত ছিলেন। তিনি (সা.) সেখানে দুই রাকাআত নামায আদায় করেন। এরপর তিনি যমযম কূপের নিকটে যান। হযরত আব্বাস বিন আব্দুল মুত্তালিব (রা.) অথবা আবু সুফিয়ান বিন হারেস বিন আব্দুল মুত্তালিব (রা.) তাঁর (সা.)-এর জন্য এক কলস পানি তোলেন। তিনি (সা.) তা থেকে পানি পান করেন এবং ওযু করেন। সাহাবীরা দ্রুত মহানবী (সা.)-এর ওযুর সেই পানি হাত পেতে নিয়ে নিজেদের চোখে-মুখে মাখতে থাকে। মুশরিকরা অবাক হয়ে তাদের এই দৃশ্য দেখছিল এবং অবাক হচ্ছিল আর বলছিল, আমরা এত বড়ো বাদশার কথা পূর্বে কখনও শুনিও নি আর দেখিও নি!

মক্কা বিজয়ের পর মহানবী (সা.) হুবল মূর্তিটি ভেঙে ফেলার নির্দেশ প্রদান করেন। তদনুযায়ী সেটি যখন ভেঙ্গে ফেলা হয়, আর এ সময় মহানবী (সা.) সেটির পাশেই দাঁড়িয়ে ছিলেন, তখন হযরত যুবায়ের বিন আওয়াম (রা.) হযরত আবু সুফিয়ানকে বলেন, হে আবু সুফিয়ান! হুবলের মূর্তিটি ভেঙে ফেলা হয়েছে, অথচ তুমি উহুদের যুদ্ধের দিন একে নিয়ে অনেক দম্ভ করেছিলে। তুমি যখন এই ঘোষণা করেছিলে যে, সে তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছে [অর্থাৎ হুবল অনুগ্রহ করেছে।] তখন আবু সুফিয়ান বলে, হে আওয়ামের পুত্র! এসব কথা এখন বাদ দাও। কেননা আমি বুঝতে পেরেছি, মুহাম্মদ (সা.)-এর খোদা ছাড়া যদি অন্য কোনো খোদা থাকতো তাহলে আজ যা ঘটেছে– তা ঘটত না। এরপর মহানবী (সা.) কা'বা গৃহের এক কোণে বসে পড়েন আর লোকেরা তাঁর (সা.) চারপাশে সমবেত হয়। হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) মক্কা বিজয়ের দিন উপস্থিত হন এবং হযরত আবু বকর (রা.) নিরাপত্তার জন্য তাঁর (সা.) মাথার কাছে তরবারি হাতে দাঁড়িয়ে ছিলেন।

হযরত ইবনে উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, মহানবী (সা.) মক্কা বিজয়ের বছর উসামা বিন যায়েদের উটনীতে চড়ে মক্কায় আসেন, এরপর উসমান বিন তালহা (রা.)-কে ডেকে বলেন, আমার কাছে (কা'বা ঘরের) চাবি নিয়ে আসো। তিনি (রা.) তার মায়ের কাছে (চাবির জন্য) গেলে তার মা কা'বা গৃহের চাবি দিতে অস্বীকৃতি জানায়। তিনি (রা.) বলেন, খোদার কসম! তোমাকে অবশ্যই চাবি দিতে হবে; [নিজের মাকে এ কথা বলেন;] নতুবা এই তরবারি আমার পিঠ ভেদ করে যাবে। [অর্থাৎ অন্যথায় উক্ত চাবির জন্য আমার ওপর কঠোরতা করা হবে আর তোমার ওপরও কঠোরতা করা হবে আর অবশেষে তা দিতেই হবে।] বর্ণনাকারী [তথা হযরত ইবনে উমর (রা.)] বলেন, তখন তিনি তাকে সেই চাবি দিয়ে দেন। তিনি (রা.) সেই চাবি নিয়ে মহানবী (সা.)-এর নিকটে আসেন এবং তাঁকে তা দিয়ে দেন। মহানবী (সা.) তখন সেই চাবি তাকে (রা.) ফিরিয়ে দেন, তারপর তিনি (রা.) দরজা খোলেন। মহানবী (সা.) উসামা বিন যায়েদ (রা.) এবং বিলাল বিন রাবাহ (রা.)-কে সাথে নিয়ে কা'বা গৃহের অভ্যন্তরে প্রবেশ করেন। কা'বার চাবিবাহক উসমান বিন তালহা (রা.)-ও সাথে ছিলেন। মহানবী (সা.) কা'বার ফটক বন্ধ করে দেন এবং দীর্ঘক্ষণ কা'বার অভ্যন্তরে অবস্থান করেন আর সেখানে দুই রাকআত নামায আদায় করেন। হযরত আবদুল্লাহ্ বিন উমর (রা.) যিনি বাহিরে দরজার পাশেই দাঁড়ানো ছিলেন, তিনি বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) যখন বাহিরে আসেন তখন আমি দ্রুত ভেতরে যাই আর আমি হযরত বিলাল (রা.)-কে জিজ্ঞেস করি, মহানবী (সা.) এখানে যখন এসেছিলেন তখন কী করেছিলেন? তিনি (রা.) বলেন, তিনি (সা.) একটি স্তম্ভ (তথা খুঁটি) ডান পাশে, আরেকটি খুঁটি বাম পাশে এবং পিছনে তিনটি খুঁটি রাখেন। বায়তুল্লাহ্‌তে তখন ছয়টি খুঁটি ছিল। তখন মহানবী (সা.) এমনভাবে নামায আদায় করেন যে, দুটি খুঁটির মাঝে দাঁড়িয়ে যান। সামনে একটি খুঁটি ছিল আর পেছনে ছিল তিনটি

খুঁটি। একটি বর্ণনা অনুযায়ী, তিনি (সা.) দুটি খুঁটি তাঁর বামে এবং একটি খুঁটি তাঁর ডানে এবং তিনটি খুঁটি তাঁর পেছনে রাখেন। অর্থাৎ সামনে প্রথমে যে খুঁটি ছিল সেগুলোকে এমনভাবে ভাগ করেন যেন এক পাশে দুটি, আরেক পাশে একটি এবং পেছনের দিকে তিনটি থাকে। যাহোক, তিনি (সা.) সেখানে দুই রাকাআত নামায পড়েন। এটি সহীহ মুসলিমের বর্ণনা।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বর্ণনা করেন, মক্কায় প্রবেশ করার সময় হযরত আবু বকর (রা.) তাঁর (সা.) উটের লাগাম ধরে তাঁর সাথে কথা বলছিলেন আর তিনি (রা.) সূরা ফাতহ পাঠ করছিলেন, যার মাঝে মক্কা বিজয়ের ভবিষ্যদ্বাণী ছিল। তিনি (সা.) সোজা কা'বা শরীফের দিকে আসেন আর উটে চড়া অবস্থায় কা'বা ঘর সাতবার প্রদক্ষিণ করেন। তখন তাঁর (সা.) হাতে একটি লাঠি ছিল। তিনি (সা.) কা'বা ঘর প্রদক্ষিণ করেন যা হযরত ইবরাহীম (আ.) ও তাঁর ছেলে হযরত ইসমাইল (আ.) এক খোদার ইবাদতের জন্য নির্মাণ করেছিলেন, যেটিকে পরবর্তীতে তাঁদের পথভ্রষ্ট বংশধররা মূর্তির আখড়া বানিয়ে বসিয়েছিল। আর সেই তিনশ ষাটটি মূর্তি যেগুলো সেখানে রাখা ছিল– সেই প্রত্যেকটি মূর্তিতে তিনি (সা.) লাঠি দিয়ে আঘাত করছিলেন আর বলছিলেন,

جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا (সূরা বনী ইসরাঈল: ৮২)

এ ছিল সেই আয়াত যা হিজরতের পূর্বেই সূরা বনী ইসরাইলে মহানবী (সা.)-এর ওপর অবতীর্ণ হয়েছিল। আর যার মাঝে হিজরত আর পরবর্তীতে মক্কা বিজয় হবার সংবাদ দেওয়া হয়েছিল। পশ্চিমা গবেষকরা এ বিষয়ে একমত যে, এটি হিজরতের পূর্বের সূরা। এই সূরায় বর্ণনা করা হয়েছে:

وَقُل رَّبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا (সূরা বনী ইসরাঈল: ৮১-৮২)

অর্থাৎ তুমি বলো, হে আমার প্রতিপালক প্রভু! তুমি আমাকে এই শহরে অর্থাৎ মক্কায় পুণ্যের সাথে প্রবেশ করাও; অর্থাৎ হিজরতের পর বিজয় দান করে; আর এই শহর থেকে মঙ্গলসহ বের কোরো; অর্থাৎ হিজরতের সময়; আর স্বয়ং তোমার নিকট থেকে আমার জন্য বিজয় এবং সাহায্যের উপকরণ প্রেরণ করো। আর এটি বলো যে, সত্য এসে গেছে আর মিথ্যা অর্থাৎ শিরক পরাজিত হয়ে পলায়ন করেছে, আর মিথ্যা অর্থাৎ শিরকের জন্য পরাজিত হয়ে পলায়ন করা তো চিরকালই নির্ধারিত ছিল। এই ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণ হওয়া এবং হযরত আবু বকর (রা.) যখন এই আয়াতগুলো পড়ছিলেন তখন মুসলমান ও কাফিরদের হৃদয়ে যে আবেগ সৃষ্টি হচ্ছিল– তা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়। মোটকথা সেই দিন মাকামে ইবরাহীমকে পুনরায় কেবল এক খোদার ইবাদতের জন্য [পুনরুদ্ধার করে] নির্দিষ্ট করা হয় আর চিরকালের জন্য মূর্তি ভেঙে ফেলা হয়। মহানবী (সা.) যখন হুবল নামক মূর্তির ওপর তাঁর লাঠি দিয়ে আঘাত করেন আর সেটি স্থানচ্যুত হয়ে পড়ে যায়, তখন হযরত যুবায়ের (রা.) হযরত আবু সুফিয়ানের দিকে তাকিয়ে মুচকি হেসে বলেন, হে আবু সুফিয়ান! উহুদের সেই দিন তোমার স্মরণ আছে! মুসলমানরা যখন আঘাতে জর্জরিত হয়ে একদিকে দাঁড়িয়ে ছিল, তুমি তখন দম্ভভরে ঘোষণা করেছিলে, উলু হুবল, উলু হুবল! অর্থাৎ হুবলের মর্যাদা বৃদ্ধি হোক, হুবলের প্রভাব-প্রতিপত্তি বৃদ্ধি হোক। আর এটি বলছিলে, হুবলই উহুদের দিন মুসলমানদের মোকাবেলায় তোমাদের বিজয়ী করেছিল। আজকে দেখো! হুবল তোমার সম্মুখে টুকরো টুকরো হয়ে পড়ে আছে। আবু সফিয়ান বলে, হে যুবায়ের! এসব কথা বাদ

দাও। আজ আমরা ভালোভাবে বুঝতে পারছি, **হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর খোদা ব্যতীত যদি অন্য কোনো খোদা থাকতো, তাহলে আজ আমরা যা কিছু দেখছি– তা দেখতে হতো না।** এরপর মহানবী (সা.) কা'বা গৃহের ভেতরে হযরত ইবরাহীম (আ.) ও অন্যান্যদের যেসব ছবি ছিল, সেগুলো মুছে ফেলার নির্দেশ দেন এবং খোদা তা'লার কৃত অঙ্গীকার পূর্ণ হওয়ায় কা'বা গৃহে দুই রাকআত নামায আদায় করে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। অতঃপর তিনি (সা.) বাহিরে এসে আরও দুই রাকআত নামায আদায় করেন। কা'বা গৃহের ছবিগুলো মুছে ফেলার জন্য মহানবী (সা.) হযরত উমরকে (রা.) নিযুক্ত করেছিলেন। তিনি (রা.) এই ধারণার বশে যে, হযরত ইবরাহীম (আ.)-কে তো আমরাও নবী হিসাবে মান্য করি– হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর ছবি অক্ষত রাখেন। মহানবী (সা.) যখন এই ছবি বহাল তবিয়তে দেখতে পান তখন বলেন, **হে উমর! তুমি এটি কী করেছ?** আল্লাহ্ তা'লা কি বলেন নি–

مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَٰكِن كَانَ حَنِيفًا مُّسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (সূরা আলে ইমরান: ৬৮)

অর্থাৎ ইবরাহীম (আ.) ইহুদীও ছিল না এবং খ্রিষ্টানও ছিল না, বরং সে ছিল আল্লাহ্র প্রতি সদা বিনত ও আত্মসমর্পণকারী, খোদা তা'লার সকল সত্যতা স্বীকারকারী এবং এক আল্লাহ্তে বিশ্বাসী বান্দা।

অতএব মহানবী (সা.)-এর আদেশে সেই ছবিও মুছে ফেলা হয়। আল্লাহ্ তা'লার নিদর্শনাবলি দেখে মুসলমানদের হৃদয় ঈমানে এতটাই পরিপূর্ণ হচ্ছিল এবং মহানবী (সা.)-এর প্রভাব-প্রতিপত্তির প্রতি তাদের বিশ্বাস এভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছিল যে, মহানবী (সা.) যখন যমযমের সেই ঝরনা থেকে– যা হযরত ইসমাঈল বিন ইবরাহীম (আ.)-এর পান করার জন্য আল্লাহ্ তা'লা নিদর্শনস্বরূপ নির্গত করেছিলেন– পানি পান করার জন্য আনিয়ে নেন এবং সেখান থেকে কিছু পানি পান করে অবশিষ্ট পানি দিয়ে তিনি (সা.) ওযু করেন, তখন তাঁর শরীর থেকে এক ফোঁটা পানিও মাটিতে পড়তে পারে নি। কেননা মুসলমানরা তৎক্ষণাৎ তা হাত পেতে নিয়ে নিচ্ছিল এবং বরকত হিসাবে নিজের শরীরে মাখছিল। আর (এই দৃশ্য দেখে) মুশরিকরা বলছিল, আমরা পৃথিবীতে এমন কোনো বাদশা দেখি নি যার সাথে তার জাতির লোকদের এতটা হৃদ্যতা রয়েছে!

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন: এ বিষয়টি ভালোভাবে স্মরণ রেখো যে, কা'বা গৃহে যেমন হাজরে আসওয়াদ স্থাপন করা আছে, ঠিক তেমনি মানুষের বুকের ভেতরে হৃদয় বসানো আছে। [এখানে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আমাদের হৃদয়কে হাজরে আসওয়াদের সাথে তুলনা করছেন।] তিনি (আ.) বলেন, এক সময় যেমন বায়তুল্লাহ্তে কাফিররা মূর্তি স্থাপন করে দিয়েছিল; বায়তুল্লাহ্র জন্য এমন সময় না-ও আসতে পারতো, কিন্তু এমনটি হয় নি; বরং আল্লাহ্ তা'লা এটিকে একটি দৃষ্টান্ত হিসেবে রেখেছেন। মানব হৃদয়ও হাজরে আসওয়াদের মতো এবং মানুষের বুক বায়তুল্লাহ্ সদৃশ। আল্লাহ্ ছাড়া অন্য সব চিন্তা কা'বার ভেতরে রাখা মূর্তির মতো। [অর্থাৎ হৃদয়ে আল্লাহ্ ছাড়া অন্য যে-সব ধ্যানধারণা আসে– সেগুলো সব মূর্তি।] পবিত্র মক্কার মূর্তিগুলো সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস তখনই হয়েছিল, যখন আমাদের নবী (সা.) দশ হাজার পবিত্রাত্মা ব্যক্তির সমন্বয়ে গঠিত জামা'তের সাথে সেখানে প্রবেশ করেছিলেন এবং মক্কা বিজিত হয়েছিল। সেই দশ হাজার সাহাবীদের পূর্ববর্তী গ্রন্থাবলিতে ফেরেশতা আখ্যা দেওয়া হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে তাদের পদমর্যাদা ফেরেশতাতুল্যই ছিল। মানুষের শক্তি-সামর্থ্যও একভাবে ফেরেশতার পদমর্যাদাতুল্য। যেভাবে ফেরেশতাদের এই পদমর্যাদা রয়েছে যে, يَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ (অর্থাৎ তাদেরকে যে আদেশ দেওয়া হয়, তারা তা

পালন করে;) **অ**নুরূপভাবে মানবীয় শক্তির বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, যে আদেশ তাদের দেওয়া হয় তারা সেগুলোর ওপর আমল করে। এভাবেই যাবতীয় শক্তিসামর্থ্য এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গ মানবীয় আদেশের অধীন। সুতরাং আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য সমস্ত প্রতিমার পরাজয় এবং মূলোৎপাটনের জন্য এভাবে তাদের ওপর আক্রমণ করা আবশ্যক। এই বাহিনী আত্মশুদ্ধির মাধ্যমে প্রস্তুত হয়ে থাকে এবং বিজয় তাকেই দেওয়া হয় যে আত্মশুদ্ধি করে। কুরআন শরীফে বর্ণিত হয়েছে قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا (অর্থাৎ যে ব্যক্তি এর উৎকর্ষ সাধন করেছে সে নির্ঘাত সফল হয়েছে)। হাদীসেও বর্ণিত হয়েছে, হৃদয়ের সংশোধন যদি হয়ে যায় তবে সারা দেহের সংশোধন হয়ে যায়। আর এটা কেমন অদ্ভুত ব্যাপার! চোখ, কান, হাত, পা, জিহ্বা ইত্যাদি সব অঙ্গপ্রত্যঙ্গ আসলে অন্তরের (তথা হৃদয়ের) আদেশেই কাজ করে। কোনো একটা চিন্তা মনে আসে, তারপর তা যে অঙ্গ-সম্পর্কিত হয়, সেই অঙ্গ সাথে সাথে তা বাস্তবায়নের জন্য প্রস্তুত হয়ে যায়। মসীহ্ মওউদ (আ.) এভাবে উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়েছেন, তোমাদের হৃদয়ের মূর্তিগুলোকেও ভেঙে ফেলো, তাহলেই তোমরা প্রকৃত মুমিন হতে পারবে।

মহানবী (সা.) সেখানে বক্তৃতাও প্রদান করেছিলেন। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রসূলুল্লাহ্ (সা.) মক্কা বিজয়ের দিন বলেছিলেন, এখন আর হিজরত নেই, কিন্তু জিহাদ ও নিয়্যত রয়েছে। আর যখন তোমাদের জিহাদের জন্য বের হবার আদেশ দেওয়া হবে তখন তোমরা বের হবে। আর এই মক্কা নগরীকে আল্লাহ্ তা'লা সেই দিন থেকেই পবিত্র ঘোষণা করেছেন যে-দিন তিনি আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। কিয়ামত পর্যন্ত এটা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে পবিত্র থাকবে। আমার আগে কাউকে এই শহরে যুদ্ধ করার অনুমতি দেওয়া হয় নি এবং আমাকেও কেবল এক নির্দিষ্ট দিনের কিছুটা সময়ের জন্য অনুমতি দেওয়া হয়েছে। এই শহর কিয়ামত পর্যন্ত আল্লাহ্‌র আদেশে পবিত্র থাকবে। এখানকার কাঁটাযুক্ত কিছুও তোলা যাবে না; এর শিকারি জীবজন্তুকে ধাওয়া করা যাবে না অর্থাৎ ভয় দেখানো যাবে না; কোনো পড়ে থাকা জিনিস তোলা যাবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত কেউ সেটা চিনিয়ে না দেয়। আর এর ঘাসও কাটা যাবে না। হযরত আব্বাস (রা.) বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল! শুধুমাত্র 'ইযখির' নামক ঘাস যদি কাটা যেত! [ইযখির এক ধরনের ঘাস।] কারণ এটা তাদের কারিগরদের কাজে লাগে এবং তা তাদের বাড়িঘরের জন্য প্রয়োজন হয়। মহানবী (সা.) বললেন, ঠিক আছে, শুধু ইযখির কাটা যাবে, তা-ও তোমাদের প্রয়োজনের জন্য।

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, আল্লাহ্ তা'লা যখন তাঁর রসূল (সা.)-কে মক্কা বিজয় দান করলেন, তখন তিনি (সা.) লোকদের মাঝে দাঁড়িয়ে আল্লাহ্‌র প্রশংসা ও গুণকীর্তন করেন। এরপর তিনি (সা.) বলেন, নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'লা হস্তীবাহিনীর হাত থেকে মক্কাকে রক্ষা করেছেন এবং তিনি তাঁর রসূল ও মুমিনদেরকে এই নগরীর ওপর বিজয় দান করেছেন। আমার আগে কারো জন্য তা হালাল ছিল না এবং আমার জন্যও তা দিনের একটি স্বল্প সময়ের জন্য হালাল করা হয়েছিল; আর আমার পরেও কারো জন্য তা বৈধ হবে না। অর্থাৎ মক্কা বিজয়ের দিন যুদ্ধ করা শুধুমাত্র অল্প কিছু সময়ের জন্য বৈধ ছিল, এরপর থেকে তা আর কখনো বৈধ হবে না। তাই মক্কার কোনো শিকার ধাওয়া করে ধরা যাবে না, কোনো গাছের কাঁটাও ভাঙা যাবে না, কোনো পড়ে থাকা জিনিস কুড়িয়ে নেওয়া যাবে না, তবে যদি কেউ ঘোষণা করে (মালিক খুঁজে দেবার উদ্দেশ্যে নেয়)– তাহলে তা বৈধ। আর যদি কেউ কাউকে হত্যা করে তবে সে (অর্থাৎ নিহত ব্যক্তির পরিবার) দুটি বিষয়ের মধ্যে যে-কোনো

একটি বেছে নিতে পারবে– ফিদিয়া (প্রাণের বিনিময়ে ক্ষতিপূরণ) অথবা কিসাস (প্রতিশোধ)। এসময় হযরত আব্বাস (রা.) বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! শুধু 'ইযখির' ঘাস ছাড়া, কারণ আমরা তা আমাদের কবর ও ঘরবাড়িতে ব্যবহার করি। তখন রসূলুল্লাহ্ (সা.) বললেন, ঠিক আছে, 'ইযখির' ছাড়া। সেটি কাটতে পারো।

আবু শাহ নামে একজন ব্যক্তি ছিলেন, যিনি ইয়েমেনবাসীদের একজন ছিলেন। তিনি নিবেদন করলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমার জন্য লিখে দিন। আল্লাহ্‌র রসূল (সা.) বললেন, আবু শাহের জন্য লিখে দাও। বর্ণনাকারী বলেন, আমি আওযায়ী-কে জিজ্ঞেস করলাম, তার এই কথার অর্থ কী ছিল যে, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমার জন্য লিখে দিন? তিনি বলেন, এর অর্থ হলো, মহানবী (সা.) যে ভাষণ বা খুতবা দিলেন, সেটা যেন তাকে লিখে দেওয়া হয়। অতঃপর সেটি লিখে তাকে দেওয়া হলো। সীরাত ইবনে হিশাম-এ লেখা আছে, রসূলুল্লাহ্ (সা.) কা'বা শরীফের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে বলেন, আল্লাহ্ ছাড়া ইবাদতের যোগ্য কেউ নেই। তিনি এক, তাঁর কোনো শরীক নেই। তিনি তাঁর প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করে দেখিয়েছেন এবং একাই সব দলকে পরাজিত করেছেন। হে লোকসকল! সকল গর্ব, সমস্ত প্রতিশোধ এবং যত রক্ত প্রবাহিত হয়েছে– তা আজ আমার এই দুই পায়ের নীচে রয়েছে। তবে কেবল কা'বা ঘরের চাবির দায়িত্ব এবং যমযম কূপ থেকে পানি পান করানোর দায়িত্ব যাদের কাছে আগে ছিল– তাদের কাছেই থাকবে। হে লোকসকল! যদি কেউ ভুলক্রমে কাউকে মেরে ফেলে, যেমন লাঠি বা চাবুক দিয়ে– তাহলে পূর্ণ রক্তপণ দিতে হবে, যা ১০০ উটের সমপরিমাণ। হে কুরাইশ! আল্লাহ্ তোমাদের কাছ থেকে অজ্ঞ যুগের অহংকার ও গর্ব দূর করে দিয়েছেন, যা পিতৃপুরুষদের কারণে প্রদর্শন করা হতো। এখন আর কোনো শ্রেষ্ঠত্ব নেই। সব মানুষ আদম-সন্তান, আর আদম সৃষ্টি হয়েছিলেন মাটি থেকে। অতঃপর তিনি (সা.) এ আয়াতটি তিলাওয়াত করেন,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ

(সূরা হুজুরাত: ১৪)

অর্থ: "হে মানবজাতি! নিশ্চয় আমরা নর ও নারী থেকে তোমাদের সৃষ্টি করেছি। আর আমরা তোমাদেরকে বিভিন্ন গোষ্ঠী ও গোত্রে তোমাদের বিভক্ত করেছি, যেন তোমরা একে অপরকে চিনতে পারো। তোমাদের মাঝে আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে নিঃসন্দেহে সে-ই সর্বাধিক সম্মানিত, যে তোমাদের মাঝে সর্বাধিক মুত্তাকী।"

হে কুরাইশ! আমি তোমাদের সাথে কী আচরণ করব বলে তোমরা মনে করো? কুরাইশ বলল, আপনি যা করবেন তা নিশ্চয় উত্তমই হবে; [যারা তখনো মুসলমান হয় নি– তারা একথা বলেছিল;] আপনি একজন সম্মানিত ভাই এবং সম্মানিত ভাইয়ের সন্তান। মহানবী (সা.) বললেন, তাহলে যাও, তোমরা সবাই মুক্ত। এক বর্ণনায় এসেছে, তিনি (সা.) বলেছিলেন, আমি সেই কথাই বলব যা হযরত ইউসুফ (আ.) বলেছিলেন, 'আজ তোমাদের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ নেই। আল্লাহ্ তোমাদের ক্ষমা করুন, আর তিনিই তো সর্বাধিক দয়ালু।' লোকেরা সাধারণ ক্ষমার এই ঘোষণার কথা শুনে এমনভাবে বেরিয়ে এলো যেন তারা কবর থেকে জীবিত হয়ে উঠেছে এবং তারা দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করতে শুরু করল। তারা একথা শুনে সঙ্গে সঙ্গে ইসলাম গ্রহণ করতে আরম্ভ করে।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) মক্কাবাসীদের ক্ষমা করার প্রসঙ্গে এই ঘটনার বর্ণনা এভাবে দেন:

মহানবী (সা.) যখন এ কথাগুলো শেষ করলেন এবং মক্কার লোকদেরকে তাঁর সামনে উপস্থিত করা হলো তখন তিনি বললেন, হে মক্কাবাসীরা! তোমরা দেখেছ, আল্লাহ্‌র নিদর্শনগুলো কীভাবে অক্ষরে অক্ষরে সত্য হয়েছে! এখন বলো, তোমরা যে অত্যাচার এবং শত্রুতা আল্লাহ্‌র একত্ববাদে বিশ্বাসী গরিব বান্দাদের ওপর করেছ, তার কী প্রতিদান দেওয়া উচিত? মক্কার লোকেরা বলল, আমরা আপনার কাছে সেই আচরণই প্রত্যাশা করি, যা ইউসুফ (আ.) তাঁর ভাইদের সাথে করেছিলেন। এটা আল্লাহ্‌র কুদরত ছিল যে, মক্কার লোকদের মুখ থেকে সেই একই কথা বের হলো, যার ভবিষ্যদ্‌বাণী আল্লাহ্ তা'লা আগেই সূরা ইউসুফে করে রেখেছিলেন। আর মক্কা বিজয়ের দশ বছর আগেই একথা বলে দিয়েছিলেন, তুমি মক্কাবাসীদের সাথে একই রকম আচরণ করবে যেমনটি ইউসুফ তার ভাইদের সাথে করেছিল। অতঃপর যখন মক্কার লোকদের মুখ থেকেই একথার সত্যায়ন হয়ে গেল যে, রসূলুল্লাহ্ (সা.) ইউসুফ (আ.)-এর সদৃশ এবং আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে (সা.) ইউসুফ (আ.)-এর মতোই নিজ ভাইদের ওপর বিজয় দান করেছেন, তখন তিনি (সা.) ঘোষণা করলেন: تَاللّٰهِ لَا تَثْرِيْبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ– আল্লাহ্‌র কসম, আজ তোমাদেরকে কোনো শাস্তি দেওয়া হবে না আর কোনো ধিক্কারও দেওয়া হবে না।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন:

মহানবী (সা.) যখন মক্কা বিজয় করলেন তখন সমস্ত কাফিরদের ধরে এনে তাঁর সামনে উপস্থিত করা হলো। কাফিররা নিজের মুখেই স্বীকার করল, তাদের কঠোর অপরাধের কারণে তারা মৃত্যুদণ্ডযোগ্য এবং তারা নিজেদেরকে তাঁর (সা.) দয়ার ওপর ছেড়ে দিল। তখন তিনি (সা.) সবাইকে ক্ষমা করে দিলেন এবং এই ক্ষমা পাবার জন্য ইসলাম গ্রহণের কোনো শর্তও আরোপ করেন নি, কিন্তু তারা তাঁর (সা.) এই মহানুভবতা দেখে স্বতঃস্ফূর্তভাবে মুসলমান হয়ে গেল।

অতঃপর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আরেক স্থানে বলেন:

মহানবী (সা.)-এর নৈতিক শক্তির উৎকর্ষ কেবল তখনই হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভব যখন সেই যুগের অবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত করা হয়। বিরোধীরা তাঁকে এবং তাঁর (সা.) অনুসারীদের যে পরিমাণ কষ্ট দিয়েছে, আর এর বিপরীতে এমন অবস্থায় যখন তিনি (সা.) পূর্ণ ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব লাভ করেছিলেন, তখন তিনি (সা.) তাদের সাথে যে আচরণ করেছেন– তা তাঁর (সা.) মহানুভবতাকে প্রকাশ করে। এমন কোনো কষ্ট নেই যা আবু জাহল ও তার সহযোগীরা তাঁকে এবং তাঁর নিবেদিতপ্রাণ অনুসারীদের দেয় নি। দরিদ্র মুসলিম নারীদের উটের সাথে বেঁধে বিপরীত দিকে হাঁকিয়ে দেওয়া হতো, যার ফলে তারা দ্বিখণ্ডিত হয়ে যেত– শুধুমাত্র এই অপরাধে যে, তারা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' কলেমায় কেন ঈমান এনেছে! কিন্তু তিনি (সা.) এর বিপরীতে ধৈর্য ও সহনশীলতা অবলম্বন করেছেন। যখন মক্কা বিজয় হয় তখন তিনি (সা.) لَا تَثْرِيْبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ (অর্থাৎ, আজকের দিনে তোমাদের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ নেই) বলে ক্ষমা করে দিলেন। এটি এমন এক নৈতিক উৎকর্ষ যা অন্য কোনো নবীর মাঝে দেখা যায় না। اللهم صل على محمد و على آل محمد

তিনি (আ.) আরো বলেন, মক্কায় যে-সকল লোকেরা কষ্ট দিয়েছিল, তিনি (সা.) যখন মক্কা-বিজয় করলেন, তখন চাইলে তাদের সবাইকে হত্যা করতে পারতেন; কিন্তু তিনি (সা.) দয়া প্রদর্শন করলেন এবং لَا تَثْرِيْبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ বলে দিলেন। তিনি (সা.) ক্ষমা করামাত্রই সকলে মুসলমান হয়ে গেল। এত মহান ও উত্তম নৈতিক গুণাবলি কি অন্য কোনো নবীর মাঝে

পাওয়া যায়? কখনোই না! ঐ সকল লোক– যারা মহানবী (সা.)-কে, তাঁর (সা.) আত্মীয়স্বজন ও সাহাবীদেরকে অত্যন্ত কষ্ট দিয়েছিল এবং ক্ষমার অযোগ্য যন্ত্রণা দিয়েছিল, তিনি (সা.) শাস্তি দেবার পূর্ণ ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও তৎক্ষণাৎ তাদের ক্ষমা করে দেন। অথচ যদি তাদেরকে শাস্তি দেওয়া হতো তবে তা সম্পূর্ণভাবে ন্যায়বিচার ও ইনসাফের অন্তর্ভুক্ত হতো, কিন্তু তিনি (সা.) সে সময় তাঁর ক্ষমা ও মহানুভবতার দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করেন। এগুলো এমন বিষয় ছিল যা মুজিযা ছাড়াও সাহাবীদের ওপর গভীর প্রভাব ফেলেছিল। এ কারণেই তিনি (সা.) 'মুহাম্মদ' (অতি প্রশংসিত) নামের যথার্থ প্রতীক হয়েছিলেন (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)। পৃথিবীতে তাঁর প্রশংসা করা হতো, আর একইভাবে ঊর্ধ্বলোকেও তাঁর প্রশংসা করা হতো; ঊর্ধ্বলোকেও তিনি (সা.) 'মুহাম্মদ' ছিলেন। তাঁর (সা.) এই নামটি আল্লাহ্ তা'লা বিশ্ববাসীর জন্য একটি আদর্শরূপে প্রদান করেছেন। তিনি (আ.) বলেন, যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ এ ধরনের নৈতিক গুণাবলি নিজের মধ্যে সৃষ্টি না করে, ততক্ষণ কোনো লাভ হয় না। আল্লাহ্ তা'লার প্রকৃত ভালোবাসা মানুষ নিজের মাঝে পূর্ণভাবে সৃষ্টি করতে পারে না, যতক্ষণ না সে মহানবী (সা.)-এর উন্নত নৈতিক গুণাবলি ও জীবনপদ্ধতিকে নিজের জন্য পথপ্রদর্শক ও আলোকবর্তিকা হিসেবে গ্রহণ করছে। اللهم صل على محمد و على آل محمد

অবশিষ্ট ঘটনাবলি পরবর্তীতে বর্ণনা করব। এখন আমি দুইজন প্রয়াত ব্যক্তির স্মৃতিচারণ করতে চাই এবং পরবর্তীতে তাদের গায়েবানা জানাযা পড়াব।

প্রথম স্মৃতিচারণ হলো সৈয়দা লুবনা আহমদ সাহেবার। তিনি মরহুম সৈয়দ মওলুদ আহমদ সাহেবের স্ত্রী ছিলেন। কিছুদিন পূর্বে ৭১ বছর বয়সে তিনি ইন্তেকাল করেছেন, إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। আল্লাহ্ তা'লার ফযলে তিনি মূসীয়া ছিলেন। কেন্দ্রীয় পর্যায়ে নয়, তবে নিজের মহল্লা ও হালকা পর্যায়ে লাজনা ইমাইল্লাহ্‌তে তিনি সেবা করার সুযোগ পেয়েছেন। তাঁর বিয়ে হয়েছিল সৈয়দ মওলুদ আহমদ সাহেবের সাথে, যিনি সাহেবযাদী আমাতুল হাকীম বেগম সাহেবা ও সৈয়দ দাউদ মুজাফফর শাহ সাহেবের পুত্র ছিলেন। তাদের বিয়ে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আস-সালেস (রাহে.) পড়িয়েছিলেন। যেহেতু এতে কিছু নসীহতও রয়েছে, তাই আমি বিয়ের খুতবার কিছু অংশও পাঠ করছি। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আস-সালেস (রাহে.) বলেন; [এটি বর্তমান যুগের বিয়েশাদির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য]:

বৈবাহিক সম্পর্ক গাছের কলমের মতো। শুরুতে একে খুব সাবধানে লালনপালন করতে হয়। কুরআনের নির্দেশনা অনুযায়ী, এই কলমকে 'কওলে সাদীদ' (সত্য ও সঠিক কথা)-এর সুতো দিয়ে বেঁধে রাখতে হয়, তবেই এর সুরক্ষা সম্ভব। আর এই দায়িত্ব শুধু স্বামী-স্ত্রীর ওপরই নয়, বরং তাদের পরিবার, তাদের পরিবেশ এমনকি তাদের বন্ধুবান্ধবের ওপরও বর্তায়। কারণ অনেক ধরনের অনিষ্ট মন্দ ধারণার কারণে, গীবতের ফলে, ধৈর্যহীনতা কিংবা ক্রোধের কারণে সৃষ্টি হয়। এসব থেকে রক্ষা পাবার জন্য 'কওলে সাদীদ' একটি অত্যন্ত শক্তিশালী বন্ধনসূত্র।

এরপর তিনি বলেছিলেন, আল্লাহ্ করুন, আমি এখন যে বিবাহের ঘোষণা দিচ্ছি, সেটি উভয় পরিবারের জন্য অত্যন্ত কল্যাণকর হোক, জামা'তের জন্য কল্যাণকর হোক এবং মানবজাতির জন্যও কল্যাণকর হোক, এর মাধ্যমে ধর্মসেবক বংশধারা বহমান হোক।

আমার সাথে যেহেতু তাদের আত্মীয়তার সম্পর্কও ছিল, তাই আমি জানি, হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আস-সালেস (রাহে.)-র এই বাক্যগুলোকে মোহতরমা লুবনা সাহেবা নিজ আত্মীয়তার অধিকার আদায়ের ক্ষেত্রে শিরোধার্য করার যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন। এরপর

তিনি (রাহে.) এটিও বলেন, আজকে আমি যে বিয়ের ঘোষণা দিচ্ছি, তা আমার ছোটো বোন আমাতুল হাকীম সাহেবা এবং সৈয়্যদ দাউদ মুজাফফর শাহ সাহেবের পুত্র সৈয়্যদ মওলুদ আহমদ। আর কনে হলেন, ডাক্তার সৈয়্যদ গোলাম মুজতবা সাহেবের কন্যা। ডাক্তার সাহেব যেহেতু ওয়াকেফে যিন্দেগী (জীবন উৎসর্গকারী) ডাক্তার ছিলেন, শুরুতে আফ্রিকায় ছিলেন। শুরুতে যখন নুসরত জাহাঁ স্কিমের ঘোষণা করা হলো তখন জীবন উৎসর্গকারী ডাক্তারদের মাঝে তিনি প্রথম সারিতে ছিলেন। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.) ডাক্তার সাহেবের উল্লেখ করেন, ডাক্তার সাহেব সেসব প্রারম্ভিক ডাক্তারদের মাঝে একজন, যারা পশ্চিম আফ্রিকায় জীবন উৎসর্গকারী ডাক্তার হিসেবে কাজ করেছেন। আল্লাহ্ তা'লা তার দোয়াসমূহ শ্রবণ করেছেন, তার হাতে আরোগ্য রেখেছিলেন এবং অত্যন্ত সফল শল্যবিদ (সার্জন) হিসেবে তিনি ঘানায় কাজ করেছেন। এরপর নাইজেরিয়াতেও কাজ করেছেন।

সৈয়্যদা লুবনা সাহেবার পুত্র সৈয়্যদ সউদ আহমদ, তিনিও ওয়াকেফে যিন্দেগী এবং বর্তমানে তিনি ফযলে উমর হাসপাতালের প্রশাসক। তিনি নিজ মায়ের অবস্থা সম্পর্কে বলেন, যখন আমার নানা নুসরত জাহাঁ স্কিমের অধীনে ঘানার অসোকরে যান, তখন পরিবারও সাথে ছিল; আমার মা অর্থাৎ লুবনা সাহেবাও ছিলেন। তখন তিনি ছোটো ছিলেন। [এটি লুবনা সাহেবার বিবাহের পূর্বের ঘটনা।] সে সময় যেহেতু সেখানে কোনো চিকিৎসার উপকরণ পাওয়া যেত না, তাই তিনি কিছু কাপড়ের টুকরো (ব্যান্ডেজ হিসেবে) কেটে কেটে দিতেন; বিদ্যুৎ ছিল না, ডাক্তার সাহেব টর্চের আলোতে অপারেশন করতেন। এই মেয়েও টর্চ নিয়ে সেখানে দাঁড়িয়ে থাকতেন যেন ডাক্তার সাহেব সেই আলোয় অপারেশন করতে পারেন। তিনি লেখেন, অনেক আদর করতেন, নিজ কষ্ট ভুলে গিয়ে অন্যদের সেবা করতেন। নিজ স্বামী, পিতা-মাতা, শ্বশুর-শাশুড়ি সবার অধিকার উত্তমরূপে প্রদান করেছেন এবং সত্যিকার অর্থেই প্রদান করেছেন। ১৯৮৬ সালে সিঁড়ি থেকে পড়ে গিয়েছিলেন, কোমরে ব্যথা ছিল। এরপর ক্যানসারও হয়ে গিয়েছিল। ডায়াবেটিসের সমস্যাও ছিল। কিন্তু কখনো কষ্টের বহিঃপ্রকাশ করেন নি। অত্যন্ত ধৈর্যের সাথে নিজের অসুস্থতা পার করেছেন। এমনভাবে চলাফেরা করতেন যেন সুস্বাস্থ্যের অধিকারিণী। নিজ সন্তানদের, পৌত্র-পৌত্রীদের, দৌহিত্র-দৌহিত্রীদের দোয়াও শেখাতেন। বিশেষভাবে প্রতিদিন যারা তার সাথে থাকতো− সেসব পৌত্র-পৌত্রীদের। তার দৃষ্টিশক্তি দুর্বল হয়ে গিয়েছিল। যখন তিলাওয়াত করতে পারতেন না তখন অনলাইনে পবিত্র কুরআনের তিলাওয়াত শুনতেন। মিটিংগুলোতে নিয়মিত যেতেন। একবার তাকে কেউ বলে, আপনি তো অসুস্থ, মিটিংয়ে কেন আসেন? তিনি বলেন, মিটিং হচ্ছে আর আমি যাব না! জামা'তের ব্যবস্থাপনার আনুগত্য আমার করা উচিত। জামা'তের আনুগত্যের অনুভূতি প্রবল ছিল। যেহেতু তিনি আমার (অর্থাৎ হুযূরের) স্ত্রীর ভাবী ছিলেন, তাই আমিও তাকে দেখেছি, আড়ম্বরহীন ছিলেন এবং সব রকম অবস্থার সাথে মানিয়ে নিয়ে জীবনযাপন করতেন। শ্বশুরপক্ষের অধিকার উত্তমরূপে প্রদান করেছেন। আল্লাহ্ তা'লা তার সাথে ক্ষমা ও দয়ার আচরণ করুন। তার এক পুত্র ও এক কন্যা রয়েছে। যেভাবে আমি বলেছি, তার পুত্র ওয়াকেফে যিন্দেগী। আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকেও নিজ পিতা-মাতার পদাঙ্ক অনুসরণ করার সামর্থ্য দান করুন।

দ্বিতীয় জানাযা হলো মুকাররমা নাযমুন বিবি যুবায়ের সাহেবার। তিনি জার্মানির মুহাম্মদ শাফি যুবায়ের সাহেবের স্ত্রী ছিলেন। সম্প্রতি তিনি ইন্তেকাল করেছেন, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। তিনি মূলত মরিশাসের মানুষ ছিলেন। তার পরিবারে আহমদীয়াতের সূচনা তার

দাদা মোহাম্মদ হানীফ সিধু সাহেবের মাধ্যমে হয়েছে। তার শোকসন্তপ্ত পরিবারে এক পুত্র ও এক কন্যা রয়েছেন। ছেলে আতহার যুবায়ের সাহেব হচ্ছেন হিউম্যানিটি ফার্স্ট জার্মানির চেয়ারম্যান।

আতহার যুবায়ের সাহেব লিখেছেন, তিনি অটল ঈমান ও পরম বিনয়ের প্রকৃষ্ট উদাহরণ ছিলেন। আমি দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে বলতে পারি, যেভাবে তিনি আমার লালনপালন করেছেন এবং যে-সব কথা আমাকে শিখিয়েছেন, তিনি অত্যন্ত দৃঢ় ঈমানের অধিকারিণী ছিলেন। কখনও তাকে কোনো অভাব-অনুযোগ করতে শুনি নি। যখন তিনি কঠিন অসুস্থতায় ভুগছিলেন, তখন বিশেষভাবে তার পাশে থাকার সুযোগ হয়েছিল। যখনই তিনি হুঁশ ফিরে পেতেন তখনই নামাযের বিষয়ে জিজ্ঞেস করতেন। নামাযের ব্যাপারে তিনি ছিলেন নিয়মিত ও যত্নবান। তিনি ছিলেন অতুলনীয় ধৈর্য ও সহ্য ক্ষমতার অধিকারিণী। সবসময় আল্লাহ্ তা'লার সিদ্ধান্তে সন্তুষ্ট থাকতেন।

তিনি (আতহার সাহেব) একটি ঘটনাও লেখেন, তিনি মানুষের অনেক উপকার করতেন এবং খুবই গোপনীয়তা রক্ষা করতেন। একবার কোনো এক দম্পতির কিছু পারিবারিক সমস্যা ছিল। তিনি আমাকে বলেন, তুমি স্বামীটিকে জিজ্ঞেস করো, কী নিয়ে সমস্যা? আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, তার স্ত্রী কী বলেছে– সেটা আমাকে বলুন। তিনি বলেন, সে আমাকে বিশ্বাস করে কথা বলেছে; আমি তোমাকে তা বলতে পারব না। যদি সে নিজে থেকে বলতে চায় তাহলে বলবে। তবে তুমি চেষ্টা করো যেন তাদের মধ্যে মিটমাট হয়ে যায়। খিলাফতের সাথে তার গভীর সম্পর্ক ছিল এবং তিনি খুব মনোযোগ দিয়ে খুতবা শুনতেন। তার নাতি লিখেছে, তিনি দুই-তিনবার খুতবা শুনতেন এবং বলতেন, প্রথমবারে পুরোপুরি বোঝা যায় না; আর যদি মনোযোগ দিয়ে না শোনা হয়, তাহলে কোনো উপকার নেই। আল্লাহ্ তা'লার সাথে তার গভীর সম্পর্ক ছিল। তিনি রুইয়া (সত্যস্বপ্ন) দেখতেন। তার অনেক স্বপ্ন সত্য প্রমাণিত হয়েছে।

যুবায়ের সাহেব লেখেন, এই শেষ অসুস্থতার দিনগুলোতে তিনি বলেছিলেন, আমার ক্যান্সার হয় নি তো? তখন সিটি স্ক্যান করা হলে জানা যায়, সত্যিই তার মূত্রাশয়ে ক্যান্সার হয়েছে। তিনি তাকে জিজ্ঞেস করেন, আপনি কীভাবে জানলেন? তিনি তখন বলেন, আল্লাহ্ তা'লা আমাকে জানিয়েছেন। স্বপ্নে তার এক প্রয়াত আত্মীয়া তার কাছে আসেন এবং বলেন, তোমার ছেলে হয়ত তোমাকে জানাবে না, পাছে তুমি দুশ্চিন্তায় পড়ো; কিন্তু আমি তোমাকে জানাচ্ছি, তোমার ক্যান্সার হয়েছে। এইভাবে আল্লাহ্ তা'লা তাকে আগেই তার রোগ সম্পর্কে জানিয়ে দিয়েছিলেন।

তার পুত্রবধূ জার্মান; তিনি তাদের সাথেও এমন গভীর সম্পর্ক গড়ে তুলেছিলেন এবং তরবিয়ত করেছিলেন যে, তারা জার্মান হওয়া সত্ত্বেও সব বিষয়ে তার সাথে পরামর্শ করতেন এবং তার জন্য সব ধরনের ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত।

তার এক পুত্রবধূ সুজান জুবায়ের বলেন, শাশুড়ি হিসেবে তিনি ছিলেন স্নেহ ও দয়ার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। যা কিছু তার কাছে থাকতো তাতেই সন্তুষ্ট থাকতেন। পুত্রবধূদের সাথে নিজের মেয়েদের মতোই ব্যবহার করতেন। আমাদের ভুলত্রুটি খুব আদরের সঙ্গে সংশোধন করতেন এবং সবসময় আমাদের জন্য দোয়া করতেন।

দ্বিতীয় পুত্রবধূ মারিয়া যুবায়ের বলেন, বিয়ের পর তিনি আমাকে রান্না করা এবং অতিথিদের আপ্যায়নের পদ্ধতি শেখান এবং এই কাজগুলো কোনো চাপ প্রয়োগ করা বা তির্যক কথা বলা ছাড়াই শিখিয়েছেন। আমার পড়ালেখার সময়ও তিনি আমাকে অনেক

সাহায্য করেন। পরবর্তীতে তিনি অর্থাৎ এই পুত্রবধু মেডিসিন নিয়ে পড়াশোনা করেন। তিনি বলেন, জামা'তের কার্যক্রমেও তিনি আমাকে পরিপূর্ণ সহযোগিতা করেন। আমার সন্তানদের দেখাশোনাও করতেন এবং সবসময় আমাকে সাহস ও উৎসাহ দিতেন।

আল্লাহ্ তা'লা তার প্রতি দয়া ও কৃপার আচরণ করুন এবং তার সন্তানদেরকে তার দোয়ার উত্তরাধিকারী করুন। (আমীন)

(কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্কের তত্ত্বাবধানে অনূদিত)